চতুর্থ অধ্যায়
কৃষি

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ বাংলাদেশের ছেলে অভীক মিসিসিপি-মিসৌরী নদীবাহিত দেশে বেড়াতে গিয়ে দেখলো, ওখানকার মানুষের প্রধান খাদ্যশস্যটি তার নিজ দেশে শীতকালে চাষ হয় এবং ঐ খাদ্যশস্যটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

◀ *শিখনফল: ১ ও ২ [ঢা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]*

ক. এশিয়ার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য কোনটি? ১

খ. স্থানান্তরিত কৃষি কাকে বলে?— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অভীকের ভ্রমণকৃত দেশের প্রধান খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অভীকের নিজ দেশ ও ভ্রমণকৃত দেশের প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে জলবায়ুগত নিয়ামকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এশিয়ার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান।

খ নিরক্ষীয় ও আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের অরণ্যভূমি এলাকায় মানুষ বন পরিষ্কার করে চাষাবাদ করে থাকে। এভাবে পরিষ্কারকৃত কৃষিভূমি দুই বা তিন বছর আবাদের পর চাষের অযোগ্য হয়ে পড়লে কৃষকরা অন্যত্র একইভাবে জমি তৈরি ও আবাদ করে। এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থাকে স্থানান্তরিত কৃষি (Shifting Cultivation) বলে।

যেমন— বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মিয়ানমারের পাহাড়ি অঞ্চলে স্থানান্তরিত কৃষি দেখা যায়।

গ অভীক মিসিসিপি-মিসৌরী নদীবাহিত দেশ যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে যায়। সেখানে মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য গম।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে গম মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। ফলে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দানাদার শস্যের মধ্যে গম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বর্তমান বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের প্রায় ১৬ শতাংশ বিশ্ববাজারে প্রবেশ করে। সূত্র- United States Department of Agriculture-2017। গমের বিশ্ব বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উন্নত দেশগুলো গম রপ্তানি করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো তা আমদানি করে।

সারণি : প্রধান প্রধান দেশের গমের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ-২০১৭ (হাজার মেট্রিক টন)

অবস্থান	দেশ	রপ্তানির পরিমাণ	অবস্থান	দেশ	আমদানির পরিমাণ
১.	রাশিয়া	৩৩,০০০	১.	মিশর	১২,০০০
২.	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	২৮,৫০০	২.	ইন্দোনেশিয়া	১০,৫০০
৩.	যুক্তরাষ্ট্র	২৭,২১৬	৩.	আলেজেরিয়া	৮,২০০
৪.	কানাডা	২১,০০০	৪.	ব্রাজিল	৭,৫০০
৫.	অস্ট্রেলিয়া	১৭,৫০০	৫.	বাংলাদেশ	৬,৫০০

(Source : United States Department of Agriculture-2017)

রপ্তানিকারক দেশ : রাশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, ইউক্রেন প্রধান গম রপ্তানিকারক দেশ। দেশগুলো নিজেদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ব বাজারে গম রপ্তানি করে থাকে।

আমদানিকারক দেশসমূহ : গম আমদানিকারক দেশগুলো অনিয়মিতভাবে বা অনির্ধারিতভাবে গম আমদানি করে থাকে। যেমন— ভারত, পাকিস্তান, কিউবা প্রভৃতি দেশে গম আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। আবার আলজেরিয়া, চীনে কমছে। ২০১৭ সালে প্রধান গম আমদানিকারক দেশের মধ্যে রয়েছে মিশর, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া, ব্রাজিল, জাপান, বাংলাদেশ, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশ।

ঘ অভীক বাংলাদেশের অধিবাসী। এখানে প্রধান খাদ্যশস্য ধান। তার ভ্রমণকৃত দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খাদ্যশস্য গম। এ দুটি ফসলের উৎপাদনে জলবায়ুগত নিয়ামকের ভিন্নতা রয়েছে।

ধান চাষে জলবায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জলবায়ুর উপাদানগুলোর মধ্যে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা এ দুটির উপর ধান চাষের উৎপাদন নির্ভর করে। অন্যদিকে গম উৎপাদনের প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহের মধ্যেও জলবায়ু প্রধান।

i. **বৃষ্টিপাত :** ধান চাষের জন্য বার্ষিক গড় ১০০-২৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাতের দরকার। তবে যেসব স্থানে বৃষ্টিপাত ১৭৫-২২৫ সে.মি. সেসব স্থানে ধানের ফলন ভালো হয়। গম চাষের জন্য অবস্থান অনুসারে বার্ষিক গড়ে ৩০-১০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

ii. **তাপমাত্রা :** ধান চাষের জন্য সাধারণত ১৮°-২৭° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন। ধান বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য ১৬° সে. অপেক্ষা অধিক তাপমাত্রা প্রয়োজন। চারা বৃদ্ধিকালীন সময় তাপমাত্রা ২২°-২৪° সে. এর মধ্যে থাকা আবশ্যক। অপরদিকে গম চাষের আদর্শ তাপমাত্রা হচ্ছে ১৫°-২০°সে.। গম চাষের প্রাথমিক অবস্থায় কম এবং ফসল পাবার সময় বেশি তাপমাত্রা (১৮°সে.-২২°সে.) থাকা প্রয়োজন।

বিশ্বের প্রায় ৯৫ শতাংশ ধান উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। যেমন– ভিয়েতনাম, চীন, থাইল্যান্ড। আর গম মূলত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শস্য। যেমন– আমেরিকা ও কানাডার প্রেইরি অঞ্চল। সুতরাং বলা যায়, ধান ও গম উৎপাদনে জলবায়ুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২ শাকির গ্রীষ্মের ছুটিতে মামা বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সবুজে আচ্ছাদিত বাগানের মাঝে উঁচু উঁচু বৃক্ষ দেখতে পায়। ব্যাপক এলাকায় চাষ হলেও সেখানকার ভূমিরূপ সমতল নয়। কারণ জানতে চাইলে তার মামা জানালেন যে, উক্ত ফসলের জন্য মাঝে মাঝে ছায়া এবং কিছু উঁচু জমির প্রয়োজন। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে উক্ত কৃষিপণ্যের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ◀ *শিখনফল: ৪ [চা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]*

ক. কৃষির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. ভূমিরূপ কীভাবে ধান চাষকে প্রভাবিত করে?– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষিপণ্যটি বরিশাল অঞ্চলে কেন হয় না? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতপূর্ণ কৃষিপণ্যটির বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমি কর্ষণ বা চাষ করার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করাই হচ্ছে কৃষি। যেমন– গম চাষ।

খ ভূমিরূপ ধান চাষকে প্রভাবিত করে থাকে।

উচ্চভূমি অপেক্ষা সমতল ও নিম্নভূমি ধান চাষের উপযোগী। বিশ্বের প্রায় ৯০ ভাগ ধান নদী গঠিত প্লাবন সমভূমি এবং বদ্বীপ সমভূমি অঞ্চলে (যেমন– বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম) উৎপন্ন হয়। এছাড়া বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলেও পাহাড়ের গায়ে ধানের চাষ করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষিপণ্যটি হচ্ছে চা। বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকা অনুকূল না হওয়ায় চা উৎপাদন সম্ভব হয় না।

চা চাষের জন্যে যে অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা প্রয়োজন তা বরিশালে নেই। যেমন– সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০০ থেকে ১২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত পার্বত্য ঢালু অঞ্চলে চা বাগান গড়ে তোলা হয়। পার্বত্য ঢালু অঞ্চল অপেক্ষাকৃত শীতল এবং সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকে না। চা বাগান তৈরির জন্য এ ধরনের পরিবেশ অবশ্য প্রয়োজন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চা গাছের উচ্চতা পাতার গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। অথচ বরিশাল সমুদ্র তীরবর্তী একটি অঞ্চল, যা সমুদ্রতল হতে ১০ ফুটের বেশি উঁচু নয়। বরিশালের মৃত্তিকাও চা চাষের জন্য উপযোগী নয়। এখানে মৃত্তিকা উর্বর দোআঁশ ও পলি দোঁআশ। অথচ চা চাষের জন্য কিছুটা অম্লধর্মী অথবা লৌহ মিশ্রিত মৃত্তিকা প্রয়োজন।

সুতরাং বলা যায়, প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ অনুকূল না হওয়ায় বরিশালে চা উৎপন্ন হয় না।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতপূর্ণ কৃষিপণ্যটি হচ্ছে চা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

১৮২৮ সালে এ দেশে প্রথম চায়ের বাগান গড়ে উঠেছে (চট্টগ্রামের কোদালায়)। ১৯৫৬-৬০ সালের মধ্যে সিলেটের মালনিছড়ায় পরিকল্পিত চা বাগান গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে এদেশে ১৬৭টি চা বাগান রয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ৬৬.৩৫ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হয়। এদেশে ৫৯৬০৯.৪৩ হেক্টর এলাকায় চা বাগানে প্রায় ৩ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত। এছাড়া রয়েছে প্রায় ৩ হাজার কর্মচারী এবং ১ হাজারের মতো কর্মকর্তা। বর্তমানে সিলেট এবং চট্টগ্রাম ছাড়াও, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁওয়ে চা চাষ করা হচ্ছে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের চায়ের উৎপাদন এবং রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০ ও ৩০.৯ মিলিয়ন কেজি। ১৯৯০ সালে ৪৫.৮ এবং ২৬.৯ মিলিয়ন কেজি। ২০০০ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ৫২.৬৪ এবং ১৮.১ মিলিয়ন কেজি। ২০১০ সালে বাংলাদেশ ৫৯.১৬ মিলিয়ন কেজি উৎপন্ন করে ০.৯১ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করে। FAO এর তথ্যমতে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ৬০,০৫৯ হেক্টর জমিতে ৬৪,৫০০ মেট্রিক টন চা উৎপাদন করে। ২০২৩ সালে মধ্যে বাংলাদেশ ১০০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে (Strategic development plan 2012-2023)।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেকারত্ব লাঘব ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে চা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। অভ্যন্তরীণ ব্যাপক চাহিদা থাকায় চা বর্তমানে রপ্তানিতে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। তবে দেশের অভ্যন্তরে চায়ের উৎপাদন ও বাণিজ্য ঊর্ধ্বমুখী। ২০২৩ সালে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারলে রপ্তানি বাণিজ্যেও চা ভূমিকা রেখে দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করতে অবদান রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ লাঙল-জোয়ালের বদলে ট্রাক্টরের ব্যবহার বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খণ্ড খণ্ড জমিগুলোতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। ফলে গনি মিয়ার (প্রাচীন পদ্ধতির কৃষক) বংশধরগণ বর্তমানে ফসল উৎপাদনের সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পাশাপাশি সরকারি সহযোগিতার জন্য কৃষিক্ষেত্রের সুফল ভোগ করছে।

◀ *শিখনফল: ৪ [চা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]*

ক. কৃষিকাজ কাকে বলে? ১

খ. কানাডার প্রেইরি তৃণভূমিকে "পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি" বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় কীভাবে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত দু'টি সময়ের কৃষি পদ্ধতির সুবিধা– অসুবিধা মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমিকর্ষণ বা চাষ করার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করাকে কৃষিকাজ বলে। যেমন– গম চাষ।

খ কানাডার প্রেইরি তৃণভূমি অঞ্চলটি বিশ্বের একক বৃহত্তম গম উৎপাদক অঞ্চল। স্থানীয় চাহিদার অতিরিক্ত গম উৎপন্ন হয় বলে এ অঞ্চলের অধিকাংশ গম রুটি প্রস্তুতের জন্য দেশ-বিদেশের বাজারে রপ্তানি করা হয়। এ কারণে উত্তর আমেরিকার এ অঞ্চলকে 'পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি' বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদের কথা বলা হয়েছে। যেমন– লাঙল-জোয়ালের বদলে ট্রাক্টরের ব্যবহার। মূলত বাংলাদেশের কৃষিতে ট্রাক্টর, ড্রাম সিডার, হারভেস্টার মেশিন, হিমাগার প্রযুক্তিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্তমানে এদেশের কৃষিতে (স্বল্প পরিসরে) আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে, যা এদেশের কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব বয়ে এনেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ট্রাক্টর ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ে অনেক জমি চাষ করা যাচ্ছে। বীজ বপনে ড্রাম সিডার ব্যবহারের ফলে কম পরিশ্রমে বিস্তীর্ণ জমিতে সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন করা সম্ভব হচ্ছে। আবার ফসল সংগ্রহে হারভেস্টার মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে, যা খরচের পাশাপাশি আমাদের মূল্যবান সময়ও বাঁচিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় (রাজশাহী, বগুড়া) হিমাগার নির্মিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন পচনশীল দ্রব্য (আলু) পচনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। এতে কৃষকগণ আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষিতে প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম, যা কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব বয়ে এনেছে।

ঘ উদ্দীপকে দু'টি সময়ের তথা প্রাচীন ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে।

আধুনিক কৃষি বলতে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ব্যবহার এবং ফসলাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা কৃষি কাঠামোয় পরিবর্তন আনয়নকে বুঝায়।

আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা জমি চাষ, উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল বীজ বপন, কীটনাশক ওষুধ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, উন্নত সেচ পদ্ধতি চালু এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সবই কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। সনাতন পদ্ধতিতে কাঠের লাঙল ও পশুর দ্বারা জমি চাষ করা হতো। সেচের জন্য যে পানির প্রয়োজন হতো তার জন্য প্রকৃতির দেয়া বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হতো। সার হিসেবে জমিতে গোবর বা অন্য কোনো দেশীয় সার ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তিতে ট্রাক্টর, বুলডোজার, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টার, পাওয়ার পাম্প প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষি কাজ করা হয়।

বাংলাদেশে যান্ত্রিক চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এছাড়া গভীর ও অগভীর নলকূপ, শক্তিচালিত পাম্প প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিতে উন্নত সেচ ব্যবস্থা চালু করায় প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পয়েছে।

ট্রাক্টরের সাহায্যে সনাতন পদ্ধতির তুলনায় একই সময়ে কয়েক গুণ বেশি জমি চাষ করা যায়। উপরন্তু এদেশে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত জাতের গরুর অভাব এবং গো খাদ্যেরও দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে। তাই পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টর ব্যবহারে এ সমস্যার সমাধান সহজ। এছাড়া শ্রমিকের অভাব এবং অত্যধিক মজুরি কৃষিক্ষেত্রে মৌসুমভিত্তিক যে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে তা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার ফলে বুঝা যায়, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ৪

◀ *শিখনফল: ১ ও ২ [দি. বো. ২০১৭]*

ক. মিশ্র কৃষি কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চলে কৃষির ভৌগোলিক কোন নিয়ামকসমূহ বেশি প্রভাব বিস্তার করে– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'খ' অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উৎপাদিত খাদ্যশস্যটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কৃষি খামারের এক অংশে কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন এবং অপর অংশে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রতিপালিত হলে তাকে মিশ্র কৃষি বলে। যেমন- একই পুকুরে মাছ ও হাঁস পালন।

খ বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি এদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত। দেশের মোট উৎপাদনের (জিডিপি) ১৪.৭৯ শতাংশ কৃষিখাত থেকে আসে। এদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ প্রতি বছর কৃষির প্রধানতম খাত যেমন– ফসল উৎপাদন (১৩৪,৩২২ কোটি), পশুপালন (৩৩,১৬৫ কোটি), মৎস্য চাষ (৩৭,৯২০ কোটি টাকা) ইত্যাদি থেকে প্রচুর আয় করে থাকে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। (সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭)।

গ মানচিত্রের 'ক' অঞ্চলটি হলো দক্ষিণ এশিয়া। অঞ্চলটি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল হতে এগিয়ে রয়েছে।

যেকোনো অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনের জন্য অনুকূল নিয়ামক (factors) একান্ত আবশ্যক। দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিকাজের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো (যেমন- ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, নদনদী প্রভৃতি) অধিক ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক (মূলধন, শ্রমিক, বাজার) ও সাংস্কৃতিক (জনসংখ্যা, প্রযুক্তি, সরকারি নীতি) নিয়ামকও এ অঞ্চলের কৃষির উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে।

নিচে দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিকাজে ভৌগোলিক নিয়ামকগুলো বর্ণনা করা হলো–

১. সমতল ভূমিতে যত নিবিড়ভাবে কৃষিকাজ করা যায়, পাহাড়ি অঞ্চলে তা সম্ভব হয় না। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশই সমুদ্র তীরবর্তী সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের কৃষির উপর ভূপ্রকৃতির ভূমিকা তাই অনেক বেশি। দক্ষিণ এশিয়ার পাহাড়ি ঢালু জমিতে চা, কফি, রাবার প্রভৃতি এবং সমতল ভূমিতে ধান, গম, পাট, সরিষা, ভূট্টা প্রভৃতি ভাল উৎপাদিত হয়।

২. দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিকাজ জলবায়ুর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ধান ও গম উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে ১৬-২৭ এবং ১০-১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। ১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ধান চাষ ভাল হয়। এ অঞ্চলের ক্রান্তীয় মৌসুমি এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে ধান ও গম ভাল জন্মে। যেমন– ভারত, চীন, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ।

৩. দক্ষিণ এশিয়ার নদীবাহিত উর্বর পলি দোআঁশ মৃত্তিকায় ধান, পাট, ভূট্টা প্রভৃতি ফসল ভাল জন্মে।

৪. নদ-নদী পানির অন্যতম প্রধান উৎস। তাছাড়া পলি সঞ্চয়ের কারণে নদ-নদীর উভয় তীর কৃষিকাজের জন্য উপযোগী। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার নদী অববাহিকা অঞ্চলে অধিক কৃষিকাজ হয়ে থাকে।

ঘ মানচিত্রে 'খ' চিহ্নিত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উৎপাদিত ফসলটি হলো গম।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে গম মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। ফলে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দানাদার শস্যের মধ্যে গম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বর্তমান বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের প্রায় ১৬ শতাংশ বিশ্ববাজারে প্রবেশ করে। সূত্র- United States Department of Agriculture-2017। গমের বিশ্ব বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উন্নত দেশগুলো গম রপ্তানি করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো তা আমদানি করে।

সারণি : প্রধান প্রধান দেশের গমের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ-২০১৭ (হাজার মেট্রিক টন)

অবস্থান	দেশ	রপ্তানির পরিমাণ	অবস্থান	দেশ	আমদানির পরিমাণ
১.	রাশিয়া	৩৩,০০০	১.	মিশর	১২,০০০
২.	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	২৮,৫০০	২.	ইন্দোনেশিয়া	১০,৫০০
৩.	যুক্তরাষ্ট্র	২৭,২১৬	৩.	আলেজেরিয়া	৮,২০০
৪.	কানাডা	২১,০০০	৪.	ব্রাজিল	৭,৫০০
৫.	অস্ট্রেলিয়া	১৭,৫০০	৫.	বাংলাদেশ	৬,৫০০

(Source : United States Department of Agriculture-2017)

রপ্তানিকারক দেশ : রাশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, ইউক্রেন প্রধান গম রপ্তানিকারক দেশ। দেশগুলো নিজেদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ব বাজারে গম রপ্তানি করে থাকে।

আমদানিকারক দেশসমূহ : গম আমদানিকারক দেশগুলো অনিয়মিতভাবে বা অনির্ধারিতভাবে গম আমদানি করে থাকে। যেমন— ভারত, পাকিস্তান, কিউবা প্রভৃতি দেশে গম আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। আবার আলজেরিয়া, চীনে কমছে। ২০১৭ সালে প্রধান গম আমদানিকারক দেশের মধ্যে রয়েছে মিশর, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া, ব্রাজিল, জাপান, বাংলাদেশ, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশ।

প্রশ্ন ▶৫ রুহানের বাড়ি ঢাকার মতিঝিলে। দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ যেসব উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ দ্রব্য ভোগ করে, সেসব দ্রব্য কীভাবে উৎপন্ন হয় তা সে দেখেনি বললেই চলে। তবে রুহান তার পাঠ্যবইয়ে পড়েছে যে, পৃথিবীতে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে পানি ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক জন্ম ও বৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে এসব দ্রব্য উৎপন্ন করে। এ উৎপাদন আবার জলবায়ু, মাটি, ভূপ্রকৃতি প্রভৃতির উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

[অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা] ◀ শিখনফল: ১

ক. ধান চাষে সহায়ক তাপমাত্রার পরিমাণ কত? ১

খ. আখ চাষের উপযোগী মৃত্তিকার ধরন কেমন? ২

গ. রুহান মূলত কীসের নিয়ন্ত্রণের কথা পড়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রুহানের পঠিত উপাদানগুলো ছাড়াও দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী আরও অনেক উপাদান রয়েছে– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধান চাষে সহায়ক গড় তাপমাত্রার পরিমাণ ২২° সেলসিয়াস।

খ প্রতিটি ফসলের মতোই আখ চাষে উপযোগী মৃত্তিকা রয়েছে। চুন ও পটাশ মিশ্রিত মাটি, দোঁআশ মৃত্তিকা আখ চাষের পক্ষে উপযোগী। এ ধরনের মৃত্তিকায় অধিক নাইট্রোজেন থাকে বলে আখ চাষের জন্য উপযোগী।

গ রুহান মূলত কৃষিকার্য যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান বা নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সে সম্পর্কে পড়েছে।

কৃষিকার্য জলবায়ু, মাটি, ভূপ্রকৃতি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের পেছনে জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা প্রভৃতি নিয়ামকগুলো কাজ করে। যথা:

জলবায়ু: জলবায়ু কৃষিকার্যের প্রধান ভৌগোলিক নিয়ামক। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন ও তার বণ্টন, কৃষি পদ্ধতি সবকিছু জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই বিভিন্ন জলবায়ুতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ হয়। যেমন-নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে রাবার চাষ; ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে ধান, পাট; নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে গম ব্যাপকভাবে চাষ হয়।

ভূপ্রকৃতি: কৃষিকাজ ভূপ্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমতল ভূমি পলিমাটি দ্বারা গঠিত। তাই এ ভূমি কৃষিকাজের অনুকূল। তাই পৃথিবীর অধিকাংশ কৃষিকাজ সমতল ভূমিতে হয়। যেমন– বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমি এলাকায় ধান, গম, যব, ভুট্টা চাষ হয়। অন্যদিকে উঁচু পাহাড়, টিলা পার্বত্য অঞ্চলের অসমতল জমিতে কৃষিকাজ কষ্টসাধ্য। তবে অনেক ক্ষেত্রে পাহাড়ে ধাপ কেটে কৃষিকাজ করা হয়। যেমন– পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষ।

মৃত্তিকা: মাটি বা মৃত্তিকা কৃষিকাজের অন্যতম একটি নিয়ামক। কৃষিকাজের সাফল্য মাটির ওপরই নির্ভরশীল। মাটির উর্বরাশক্তির ওপর কৃষির উৎপাদন নির্ভর করে। অনুর্বর মাটিতে কৃষিকাজ কষ্টকর।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, ফসল উৎপাদনে উপরিউক্ত প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।মূলত কৃষিকার্যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর ভূমিকা সর্বাধিক কার্যকর। রুহান পাঠ্যবইয়ে তাই জানতে পারবে।

ঘ রুহানের পঠিত প্রাকৃতিক উপাদানগুলো ছাড়াও কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য উপাদানগুলো হলো– ১. অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান ইত্যাদি।

i. মূলধন : কৃষিকাজের জন্য ট্রাক্টর, বীজ ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি বাবদ পর্যাপ্ত মূলধন প্রয়োজন। তাই মূলধন ছাড়া কৃষিকাজ সম্ভব নয়।

ii. শ্রমিক : জমি চাষ, সেচ প্রদান, ফসল সংগ্রহ, মাড়াই করা প্রভৃতি কাজের জন্য অনেক শ্রমিক প্রয়োজন। পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া গেলে কৃষিকাজ সহজ হয়।

iii. পরিবহন: উৎপাদিত পচনশীল ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য উন্নত ও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

iv. বাজার: পৃথিবীর যে অঞ্চলে যে পণ্যের চাহিদা বা বাজার থাকে সে অঞ্চলে সেই ধরনের কৃষি পণ্য উৎপাদিত হয়। যেমন– শ্রীলংকার চা চাষ।

প্রশ্ন ▶৬

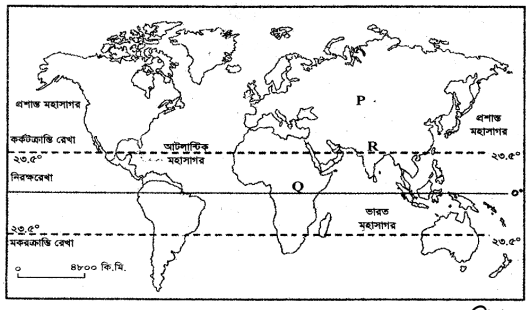

◀ *শিখনফল: ২*

ক. চা উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি? ১

খ. চা চাষের জন্য পৃথিবীর কোন অঞ্চল প্রসিদ্ধ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মানচিত্রে 'P' চিহ্নিত অঞ্চলে অধিক চা উৎপাদিত হওয়ার প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'Q' ও 'R' চিহ্নিত অঞ্চল দুটির মধ্যে চা উৎপাদনের তারতম্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চা উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ হলো চীন।

খ চা চাষের জন্য এশিয়া অঞ্চল প্রসিদ্ধ।

এশিয়া মহাদেশে বিশ্বের প্রায় ৮০% (৫,০৬৬,৯৪৫ মেট্রিক টন) চা উৎপাদন করা হয়ে থাকে (সূত্র : FAOSTAT-2018)। এছাড়া চা চাষের উপযোগী নিয়ামক যেমন– জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূপ্রকৃতি, ছায়াদানকারী বৃক্ষ ছাড়াও শ্রমিক, মূলধন, পরিবহন ব্যবস্থা, বাজার, কৃষি উপকরণ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় এ অঞ্চলটি চা উৎপাদনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

গ মানচিত্রে 'P' চিহ্নিত অঞ্চল তথা এশিয়া মহাদেশে অধিক চা উৎপাদিত হওয়ার পেছনে বেশ কিছু প্রাকৃতিক নিয়ামক ক্রিয়াশীল।

অর্থকরী ফসলের মধ্যে সারাবিশ্বে পানীয় হিসেবে চা সর্বাধিক জনপ্রিয়। বিশ্বের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বাগিচা কৃষির (Farming) ফসল হিসেবে চা উৎপন্ন হয়। এশিয়ার চীন, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, জাপান প্রভৃতি দেশেই বিশ্বের অধিকাংশ চা উৎপন্ন হয়। চা চাষের জন্য এশিয়ার বিদ্যমান প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

জলবায়ু: চা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। ফলে অধিক উত্তাপ ও বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে চায়ের আবাদ ভালো হয়, যা এ অঞ্চলে বিদ্যমান রয়েছে।

মৃত্তিকা: পানি সহজেই নেমে যায় এমন উর্বর লৌহ মিশ্রিত দোআঁশ মাটি চা চাষের বিশেষ উপযোগী। সেই সাথে পরিমাণমতো নাইট্রোজেন, জিঙ্ক ও পটাশিয়াম মিশ্রিত মৃত্তিকা বিদ্যমান থাকায় এশিয়ায় চায়ের ফলন ভালো হয়।

ভূপ্রকৃতি: উচ্চভূমিতে পানি নিষ্কাশন দ্রুত ও সহজে হয় বলে পৃথিবীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট চা বাগান উচ্চ ভূমিতেই অবস্থিত। কারণ চা গাছের গোড়ায় পানি জমলে তা সহজেই মরে যায়। এ কারণে পাহাড়ের ঢালে চায়ের চাষ হয়ে থাকে, যা এ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

উপর্যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহের কারণে 'P' চিহ্নিত অঞ্চলে অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে অধিক চা উৎপন্ন হয়।

ঘ মানচিত্রে 'Q' চিহ্নিত অঞ্চলটি হলো কেনিয়া এবং 'R' চিহ্নিত অঞ্চলটি হলো ভারত। দুটি অঞ্চলেই চা চাষের জন্য অনুকূল ভৌগোলিক নিয়ামক উপস্থিত থাকলেও উৎপাদনগত তারতম্য রয়েছে।

এশিয়া তথা বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় চা উৎপাদনকারী দেশ ভারত। এ দেশে কয়েক হাজার চা বাগান রয়েছে। বেশির ভাগ বাগান আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এর চা বাগান থেকে বিশ্বমানের চা উৎপাদিত হয়। এখানকার চা বাগানগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০০ মিটারের অধিক উচ্চতায় অবস্থিত। মেঘালয় এবং দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু ও কেরালা রাজ্যে অবস্থিত বাগানগুলো থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চা পাতা সংগ্রহ করা হয়। ২০১৬ সালে ভারতে ১,২৫২,১৭৪ মেট্রিক টন চা পাতা উৎপাদিত হয়েছে।

অন্যদিকে কেনিয়া পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদক দেশ। এটি আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় চা উৎপাদনকারী দেশ। ২০১৬ সালে এখানে প্রায় ৪৭৩,০০০ মেট্রিক টন চা উৎপন্ন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ভারত ও কেনিয়ার চা উৎপাদনের পরিমাণগত তারতম্য রয়েছে।

সূত্র : FAOSTAT-2018।

প্রশ্ন ▶ ৭ খুলনা অঞ্চলের মৎস্য ব্যবসায়ী আব্বাস উদ্দীন। তার দুটি ট্রলার আছে। মাছ ধরার পাশাপাশি তিনি এগুলো আনা-নেয়ার কাজেও ব্যবহার করেন। এটাই তার কর্মসংস্থানের একমাত্র মাধ্যম। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. ধান কী জাতীয় ফসল? ১

খ. ঋতু নিরপেক্ষ ফসল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত ক্ষেত্র ছাড়াও কৃষির প্রাচীনতম ক্ষেত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আব্বাস উদ্দীন বাংলাদেশের কৃষির যে খাতে নিয়োজিত তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধান এক প্রকার তৃণজাতীয় কৃষিজ ফসল।

খ যেসব ফসল সারা বছর চাষ করা হয় তাদেরকে ঋতু নিরপেক্ষ ফসল বা বারমাসী ফসল বলা হয়।

আমাদের দেশে ঋতু নিরপেক্ষ ফসলগুলোর মধ্যে লালশাক, বেগুন, মরিচ, পেঁপে, কলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ কৃষির প্রাচীনতম ক্ষেত্র হচ্ছে ফসল তথা শস্য উৎপাদন।

জমি চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল (ধান, গম, ডাল, পাট) নিয়ে কৃষির এই খাত গঠিত। শস্য মূলত খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল এই দুই ধরনের। বিশ্বে মোট আবাদি জমির অধিকাংশ (প্রায় ৭০ শতাংশ) ব্যবহৃত হয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে। অবশিষ্ট জমি অর্থকরী ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যসমূহের মধ্যে ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অর্থকরী ফসলসমূহের মধ্যে ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু, আলু, তামাক, পাট, রেশম, রাবার, চা প্রভৃতি প্রধান। বিশ্বে কৃষিখাতের প্রায় ৬০ শতাংশ লোক শস্য উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

ঘ উদ্দীপকে আব্বাস উদ্দীন মৎস্য উৎপাদনে নিয়োজিত, যা বাংলাদেশের কৃষির দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত।

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, পুকুর ইত্যাদি জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এদেশের বিভিন্ন উৎস হতে (জলাশয়-২৮%, মৎস্য চাষ-৫৬%, সমুদ্র-১৬%) মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪.১৩৪ মিলিয়ন টন। বাংলাদেশের জিডিপিতে এককভাবে মৎস্য খাতের অবদান প্রায় ৩.৬১ শতাংশ। (সূত্র-Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh, 2018)

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়ানো গেলে এ খাতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সম্ভব। এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে প্রাকৃতিক মাছের প্রাচুর্যের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন জাতের মৎস্য চাষের অবারিত সুযোগ। বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষের প্রসার এ দেশের অর্থনীতিকে করেছে মজবুত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হিমায়িত ও জীবিত মাছ রপ্তানি করে দেশের আয় হয়েছে প্রায় ৫২৬.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে চিংড়ি রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৪৪৬.০৪ মিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩৪,১৮৮ মেট্রিক টন। (সূত্র-বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন-বিএফএফইএ-২০১৮) আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে মৎস্যখাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৮

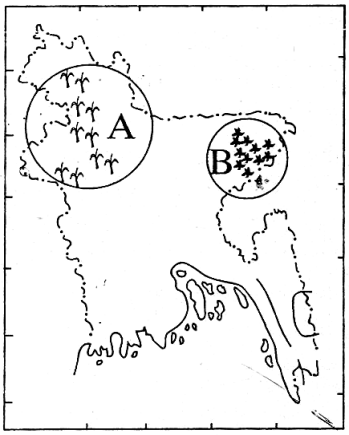

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. চিত্রের A এবং B অঞ্চলে কোন শ্রেণির কৃষি দেখা যায়? ১

খ. উত্তরাঞ্চল ইক্ষু চাষের জন্য কেন উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রের A এবং B অঞ্চলের কৃষি ফসলের জন্য কী পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রের A এবং B অঞ্চলের কৃষি ফসলগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিত্রের A ও B অঞ্চলে বাণিজ্যিক বাগান কৃষি দেখা যায়। এখানে যথাক্রমে ইক্ষু ও চা কৃষিকে বুঝানো হয়েছে।

খ প্রাকৃতিক নিয়ামকের অনুকূল অবস্থা বিরাজ করায় দেশের উত্তরাঞ্চলে ইক্ষু চাষ প্রসার লাভ করেছে।

ইক্ষু চাষের জন্য উর্বর চুন মিশ্রিত দোআঁশ মাটি এবং মৃদু ঢালু সমতল ভূমি প্রয়োজন। এর জন্য ১৯°–২৮° সে. তাপমাত্রা এবং প্রথমদিকে ১৫০ সে.-১৭৫. সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এছাড়া শ্রমিক ও মূলধন প্রাপ্তি, সরকারি সহযোগিতা প্রভৃতি সুবিধা থাকায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ইক্ষু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

গ A অঞ্চলটি হলো রাজশাহী। এখানে উৎপন্ন কৃষি ফসলটি হলো ইক্ষু। B অঞ্চল সিলেটে উৎপন্ন ফসলটি হলো চা।

ইক্ষু ও চায়ের জন্য পরিমিত পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা প্রয়োজন।

ইক্ষু: ইক্ষু চাষের জন্য বৃষ্টিপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১২৫ হতে ১৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাত ইক্ষু চাষের জন্য আদর্শ। তবে ১২৫

সে.মি. এর কম বৃষ্টিপাত হলে পানি সেচের প্রয়োজন হয়। আর ফসলটি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা হচ্ছে ১৯°–২৮° সে.।

চা: চা চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। সাধারণত ১৫০ হতে ২৫০ সে.মি. বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে চা চাষ ভালো হয়। এর জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা হচ্ছে ১৬°–১৭°সে.।

ঘ চিত্রের A ও B অঞ্চল দু'টি হলো যথাক্রমে বাংলাদেশের রাজশাহী এবং সিলেট। উক্ত অঞ্চল দু'টির কৃষির বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো–

রাজশাহী অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গা সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত। ফলে এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ধানের চাষ হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে গম চাষের অনুকূল অবস্থা বিরাজমান থাকায় একে গম চাষের আদর্শ অঞ্চল বলে ধরা হয়। ইক্ষু চাষের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা, চুন মিশ্রিত দোআঁশ মাটি এবং মৃদু ঢালু সমতল ভূমি থাকায় এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইক্ষু চাষ হয়। বাংলাদেশের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় দেশের ৭০ ভাগ তুঁত গাছের চাষ হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে পরিমিত উত্তাপ এবং মৃত্তিকার উপযোগিতার কারণে ভূট্টা ও পাটেরও ব্যাপক চাষাবাদ হয়।
অন্যদিকে সিলেটে পাহাড়ি ঢালু জমি এবং বৃষ্টিপাতের আধিক্য থাকায় এখানে ব্যাপকভাবে চা-এর চাষ হয়। তাছাড়া এ অঞ্চলের যেসব জায়গা সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত এবং উর্বর মৃত্তিকা বিদ্যমান সেসব জায়গায় ধানের চাষাবাদ হয়। এছাড়া কিছু পাহাড়ি ভূমিতে রাবারের চাষ করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, A ও B অঞ্চল দুটির মধ্যে কৃষির বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পার্থক্য থাকায় ফসল উৎপাদনেও ভিন্নতা দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৯ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ সরাসরি একটি পেশার সাথে জড়িত। এর মাধ্যমে এ দেশে বিভিন্ন ধরনের 'X' উৎপাদন করা হয়, যা দিয়ে দেশের মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা হয়।

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. ২০১০ সালের হিসাব অনুসারে ভারতের ধান উৎপাদনের পরিমাণ কত? ১

খ. বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অধিক ধান উৎপাদন হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের পেশার সঠিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অবদান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের উক্ত খাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১০ সালের হিসাব অনুসারে ভারতের ধান উৎপাদনের পরিমাণ ১৪.৩৯ কোটি মেট্রিক টন।

খ বাংলাদেশের সর্বত্রই ধান উৎপাদন হয়। এর মধ্যে অনুকূল পরিবেশে উত্তরাঞ্চলে সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে উর্বর মৃত্তিকা এবং প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা (১৮°-২৭° সে.) ও বৃষ্টিপাতের (১০০-২৫০ সে.মি.) জন্য অধিক ধান উৎপাদন হয়। তাছাড়া পর্যাপ্ত মূলধন, সুলভ শ্রমিক, ব্যাপক চাহিদা প্রভৃতি অর্থনৈতিক অবস্থাও এ অঞ্চলে ধান উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে কৃষি পেশার কথা বলা হয়েছে কারণ, বাংলাদেশের প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষি পেশার সাথে জড়িত।

কৃষির উন্নয়নে এদেশে সংশ্লিষ্ট যেসব কৃষি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে সেগুলো সম্পর্কে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC): এ সংস্থার মূল কাজ বীজের উৎপাদন, উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন এবং বীজের গুণ বৃদ্ধি করা। কৃষিক্ষেত্রে এ সংস্থার ব্যাপক অবদান লক্ষ করা যায়।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ সংস্থা কৃষিতে গবেষণা ও ফলপ্রসূ কৃষি সম্প্রসারণ সেবাদানের মাধ্যমে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল: এ সংস্থা কৃষি, বন, পরিবেশ, মৎস্য ও পশুপালন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা সংস্থা (BRRI): এ সংস্থা নতুন নতুন বীজের উৎপাদন, উচ্চ ফলনশীল ধান বীজের উদ্ভাবন এবং ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা ইত্যাদিতে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা সংস্থা (BARI): এ সংস্থা বহু শস্য গবেষণায় নিয়োজিত। শস্য ব্যবস্থাপনা, রোগ ও পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, খামার যন্ত্রপাতির উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে, যা শস্যের উৎপাদন, বিপণন এবং ভোগে অবদান রাখছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি সংস্থা, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন বিভাগ, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ইত্যাদি সংস্থা কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ঘ উক্ত খাতটি হচ্ছে কৃষি খাত।
বাংলাদেশে কৃষি খাতে প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ সরাসরি নিয়োজিত এবং দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণে খাতটি একমাত্র নির্ভরতা। এই খাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।
বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হলো কৃষি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুসারে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল প্রায় ২০ শতাংশ। বাংলাদেশের কৃষি খাতের অর্থকরী ফসল ও খাদ্যশস্য পৃথকভাবে অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। অর্থকরী ফসলের মধ্যে বাংলাদেশ ২০১৪-১৫ সালে পাট রপ্তানি করে প্রায় ৮৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। পাটের প্রধান ক্রেতা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতি। বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, রাশিয়া, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রে চা রপ্তানি করে। বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান উল্লেখযোগ্য। যদিও ব্যাপক স্থানীয় চাহিদার কারণে প্রতিবছর প্রচুর চাল আমদানি করতে হয়। এছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্য যেমন; গম, যব, ভূট্টা, ডাল ইত্যাদি উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই এগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তবে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে

স্বয়ং সম্পূর্ণতার চেষ্টা এর অর্থনৈতিক গুরুত্বকে বাড়িয়েই তুলেছে। এছাড়া মৎস্যচাষ ও পশুপালন দেশের আমিষের চাহিদা পূরণসহ অর্থনীতির অন্যতম খাত হিসেবে ভূমিকা রাখায় এ খাতের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য সম্পদের মধ্যে চিংড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

সুতরাং বলা যায়, কৃষি খাতের অধিকাংশ শস্য বা উপাদান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই কৃষি খাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶১০ সামীর বাংলাদেশের একটি কৃষি সংস্থায় চাকরি করেন। তার সংস্থাটি বাংলাদেশে উচ্চফলনশীল ধান বীজ উদ্ভাবন করে। সংস্থাটি গবেষণা করে লবণাক্ত স্থানে চাষের উপযোগী ধান বীজ উৎপাদন করে। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. বাংলাদেশে কতটি চা-বাগান আছে? ১

খ. বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিবরণ দাও। ২

গ. উদ্দীপকে সামীরের সংস্থাটি কোন ধরনের? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ এ ধরনের আরও অনেক সংস্থা রয়েছে- কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে মোট ১৬৩টি চা-বাগান আছে।

খ বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণের অন্যতম খাত হলো মৎস্যক্ষেত্র।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্য খাত উল্লেখ্যযোগ্য। এগুলো মূলত সামুদ্রিক লোনা পানির মাছ। এর মধ্যে লাক্কা, রূপচাঁদা, চিংড়ি, পোয়া, ভেটকি, কোরাল ইর্ত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমার আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ক্ষেত্রের আয়তনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ উদ্দীপকে সামীরের সংস্থাটি একটি কৃষি বিষয়ক সংস্থা। এর নাম হলো- 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট'।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ কৃষিতে উত্তরোত্তর সফলতা অর্জন করে আসছে। এর পেছনে একদিকে যেমন রয়েছে কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম, অন্যদিকে তেমনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয় এবং তার অধীন বিভিন্ন সংস্থা। আর এসব সংস্থার একটি হলো 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট'। সংক্ষেপে এ সংস্থাকে BRRI বলা হয়। এর পূর্ণ নাম Bangladesh Rice Research Institute. নতুন নতুন বীজের উদ্ভাবন, পুরানো কম উৎপাদনশীল বীজের পরিবর্তে উচ্চফলনশীল ধান বীজের উদ্ভাবন (ব্রি ধান ২৮, ৩৬) এবং ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এ সংস্থার প্রধান কাজ। এ সংস্থা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আইলা এবং সিডরের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের ফসলের যে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে, তা পুষিয়ে নিয়ে নতুন বন্যা প্রতিরোধক (Flood tolerent) লবণ সহিষ্ণু বীজ (ব্রি ধান-৪৭) উদ্ভাবন করেছে।

সুতরাং বলা যায় যে, 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট' এ দেশের কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষকদের সহায়তা করে আসছে।

ঘ বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতো আরও অনেক সংস্থা এদেশে রয়েছে।

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৭৫ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ বালাই দমন, মৃত্তিকা উন্নয়ন, বীজ উদ্ভাবন এবং বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার অধীন বিভিন্ন সংস্থার ব্যাপক অবদান লক্ষ করা যায়। এ সংস্থাসমূহের মূল কাজ হলো উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন এবং বীজের গুণাগুণ বৃদ্ধি করা। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা। এটি কৃষিতে গবেষণা ও ফলপ্রসূ কৃষি সম্প্রসারণ সেবাদানের মাধ্যমে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারে আধুনিকায়ণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করে থাকে। এ সংস্থা কৃষি, বন, পরিবেশ, মৎস্য ও পশুপালন, গ্রামীণ উন্নয়ন থেকে শুরু করে শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করে থাকে। এ সংস্থাকে সংক্ষেপে BARC (Bangladesh Agricultural Research Institute) বলে।

কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ সংস্থা বহু শস্য যেমন- ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি, ফল, ফুল ইত্যাদি উন্নয়নের সাথে জড়িত। প্রজাতি উন্নয়ন ছাড়াও এ সংস্থা অপ্রচলিত এলাকা- যেখানে ফসলের চাষ হয় না, সেখানকার মাটি ও শস্য-ব্যবস্থাপনা, রোগ ও পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, সেচ ও পানি-ব্যবস্থাপনা, খামার যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, রোপণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং খামার-পদ্ধতি এবং আর্থসামাজিক বিষয়ে গবেষণা করে থাকে। অর্থাৎ সংস্থাটি শস্যের উৎপাদন, বিপণন ও ভোগের সাথে সম্পৃক্ত।

এসব সংস্থা ব্যতীত আরও অনেক সংস্থা যেমন– বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি সংস্থা (BINA), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶১১ রমজান আলী তার কৃষি জমিতে সারা বছর একই ধরনের ফসলের চাষ করেন না। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত ধানের চাষ করলেও জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি তার কৃষিজমিতে ভূট্টা এবং সয়াবিনের চাষ করেন। আবার বছরের শেষ সময়ে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই চার মাস তিনি আলু ও পিঁয়াজের চাষ করেন। ◀ *শিখনফল: ৮*

ক. ঋতু নিরপেক্ষ ফসল কাকে বলে? ১

খ. চা চাষের জন্য কী ধরনের মৃত্তিকা উপযোগী? ২

গ. রমজান আলীর বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রমজান আলীর চাষকৃত ফসলগুলো কোনটি কোন ঋতুর নির্ণয় করে উক্ত ঋতুগুলোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ফসল সারা বছর চাষ করা হয় সেগুলোকে ঋতু নিরপেক্ষ ফসল বলে। যেমন– বেগুন, সয়াবিন।

খ চা চাষের জন্য পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত ঢালু, উর্বর, লৌহ মিশ্রিত দোআঁশ মাটি বিশেষ উপযোগী। তবে সেই সাথে পরিমাণমতো নাইট্রোজেন, জিঙ্ক ও পটাসিয়াম সার প্রয়োগ করা দরকার।

গ রমজান আলী একই জমিতে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করেন। মূলত ঋতু বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি ফসল চাষ করেন।

বাংলাদেশ মৌসুমি জলবায়ুর দেশ। এ জলবায়ুর জন্য বাংলাদেশে প্রধানত তিনটি ঋতু দেখা যায়। যেমন- গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত। এ কারণে ঋতু অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদিত হয়।

যে কোনো ফসল জন্মাতে গেলে তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। এক এক ফসল এক এক ধরনের তাপ, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতায় ভালো জন্মে। ফলে বাংলাদেশে ঋতুভেদে বিভিন্ন ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। তাই রমজান আলী একই জমিতে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করেন।

ঘ রমজান আলীর চাষকৃত ফসলগুলো হলো ধান, ভূট্টা, সয়াবিন, আলু এবং পিঁয়াজ।

মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত রমজান আলী ধান চাষ করেন। এ সময় বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে। জুন থেকে অক্টোবর মাস সময়কালে তিনি তার কৃষিজমিতে ভূট্টা এবং সয়াবিনের চাষ করেন। এ সময়ে বাংলাদেশে বর্ষাকাল বিরাজ করে। আবার নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস সময়কালে তিনি আলু ও পিঁয়াজের চাষ করেন। এ সময়ে বাংলাদেশে শীতকাল বিরাজ করে।

নিচে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকালের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হলো–

গ্রীষ্মকাল	১. বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জৈষ্ঠ্য) পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। ২. এ সময় গড় তাপমাত্রা ২৮° সেলসিয়াস। ৩. গ্রীষ্মকালে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫১ সেন্টিমিটার। কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৪. গ্রীষ্মকালের জন্য বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। এ সময় বাংলাদেশের দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ অধিক উত্তাপের প্রভাবে উপরে উঠে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ু-প্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষে বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হয়।
বর্ষাকাল	১. বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস (জৈষ্ঠ্য-কার্তিক) পর্যন্ত বর্ষাকাল। ২. এ সময়ের গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস। ৩. বর্ষাকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাষ্প সমৃদ্ধ থাকে। এ জলীয়বাষ্প শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ৪. জুন মাসে বাংলাদেশের উপর সূর্যের অবস্থানের কারণে বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। বঙ্গোপসাগর থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম অয়ন বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করলে বর্ষাকাল আরম্ভ হয়।
শীতকাল	১. বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস (কার্তিক-ফাল্গুন) পর্যন্ত সময়কে শীতকাল বলে। ২. এ সময় গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস। ৩. শীতকালে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এ সময়ে ১০ সেন্টিমিটারের অধিক নয়। ৪. উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১২

ফসলের নাম	অনুকূল অবস্থা
X	পললগঠিত প্লাবন সমভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল ফসলটি চাষের অনুকূল অবস্থা।
Y	ফসলটির চাষের জন্য পাহাড়ি প্রকৃতির ঢালু জমি আবশ্যক।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. চা মূলত কী? ১

খ. গম চাষের অনুকূল ভূপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'X' ফসলটি চাষের জন্য কী ধরনের জলবায়ু প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' এবং 'Y' ফসলটির মধ্যে কোনটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি বলে তুমি মনে করো? ৪